নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৯

শাদ্বল

দ্বিমাসিক সাহিত্য ই-পত্রিকা

তৃতীয় ই-সংখ্যা, ১লা বৈশাখ, ১৪২৯

(১৫ই এপ্রিল ২০২২ ইং)

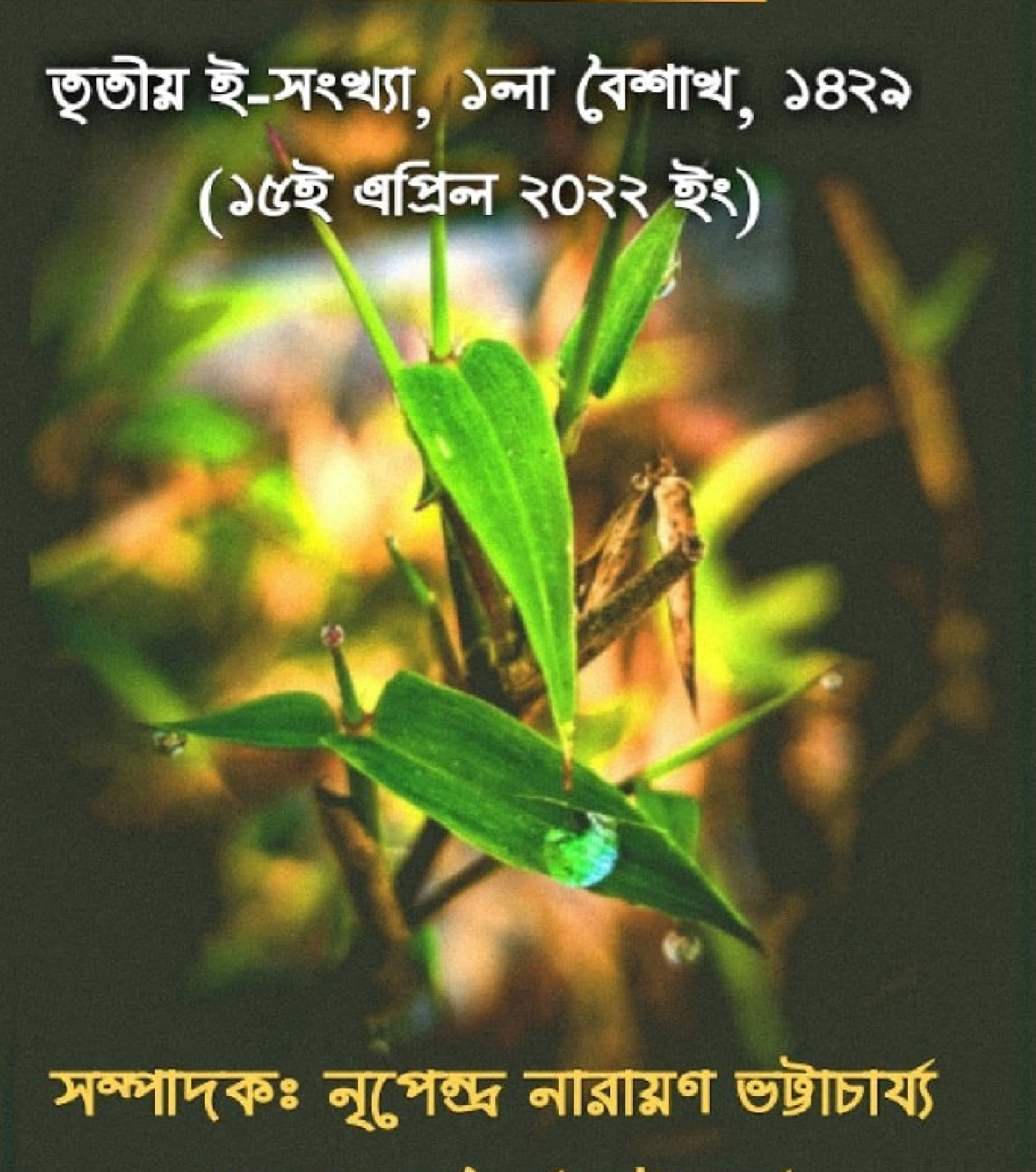

সম্পাদকঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ সৌকর্ষ ভট্টাচার্য্য

FB page link: www.facebook.com/Shadwalpatrika

শাদ্বল ই-পত্রিকা

সম্পাদকঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ সৌকর্ষ ভট্টাচার্য্য

টাইপ সেটিং ও মূদ্রণঃ সম্পাদক, শাদ্বল

ঠিকানাঃ পোঃ খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার সদর
জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

সম্পাদকীয়

শাদ্বল ই-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা নববর্ষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। সময়াভাবের কারনে পত্রিকাটি এখন থেকে পাক্ষিক নয় দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পাবে। আমি খুব আপ্লুত এই কারনে যে পত্রিকার গুণগ্রাহী লেখক-লেখিকা সাহিত্যসাধকবৃন্দ ও সর্বোপরি পাঠকবৃন্দ পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ ও সমৃদ্ধি কামনা করে অনেক শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন, যাদের ঐকান্তিক উৎসাহ এই পত্রিকার চলার পথের পাথেয়। এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গিয়ে আমি আরো বেশী আনন্দিত এই কারনে যে এই সংখ্যায় সকল বরেণ্য সাহিত্যসাধকের লেখার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে আমার জীবনের দুই বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর লেখা – যাদের একজন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মাননীয় শ্রী শুভাশিস চৌধুরী মহাশয় যিনি আমার বিদ্যালয় জীবনের শিক্ষাগুরু, আর অপর জন আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শিক্ষাগুরু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা মাননীয়া শ্রীমতি ঊর্মিলা চক্রবর্তী মহাশয়া। তাদের আশীর্বাদ 'শাদ্বলে'র চলার পথের শক্তি। অন্যান্য বারের মতো এই সংখ্যাতেও অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট লেখনীর পাশাপাশি থাকছে তরুণ লেখকগনের লেখা, সেই সাথে থাকছে কচিকাঁচাদের বিশেষ পাতা 'পাতাবাহার' যেখানে স্থান পেয়েছে শিশু-কিশোরদের লেখা। 'শাদ্বল' এভাবে সবাইকে নিয়ে চলবে, স্থান করে দেবে তাদেরকেও যারা সাহিত্যসৃষ্টির জগতে হাটতে শিখবে বলে ভাবছে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছে আমার ছেলে সৌকর্ষ। ওর জন্যও অনেক শুভকামনা। এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'শাদ্বলে'র অভিপ্রায় নিয়ে আর কিছু লিখবার নেই এই কারনে যে আমার শিক্ষক মাননীয় কবি শ্রী শুভাশিস চৌধুরী মহাশয় তার 'শাদ্বল' নামের কবিতাটিতে (যা এই সম্পাদকীয়র পরেই প্রকাশিত হয়েছে) 'শাদ্বলে'র সার্বিক অভিপ্রায় সুন্দর দ্যোতনায় ব্যক্ত করেছেন। এই সংখ্যার সকল লেখক-লেখিকা সাহিত্যসাধক ও পাঠকবৃন্দকে এই পত্রিকায় সমগুরুত্বের আসন অর্পণ করে এই সংখ্যার সম্পাদকের বিবৃতি শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক/ শাদ্বল

নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৯

শাদ্বল

তৃতীয় ই-সংখ্যা, ১লা বৈশাখ, ১৪২৯

(১৫ই এপ্রিল, ২০২২ ইং)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

শাদ্বল / শুভাশিস চৌধুরী

আঙুলে আঙুল / উর্মিলা চক্রবর্তী

গূঢ় অন্ধকার / সন্তোষ সিংহ

পুরুষ / সেবু মোস্তাফিজ

ইদানিং / শৈবাল মজুমদার

অঘ্রানে হীরক শিশিরে / নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

উদযাপন / পার্থ সারথি চক্রবর্তী

পলাশের পাপড়ি / সঞ্জয় সোম

হাসপাতাল / সুবীর সরকার

শ্রীরাধিকার নোনাজল / চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

অন্ধকার / নরেশ মল্লিক

বেলা অবেলা / সজল কুমার দে

বিসর্জন: মহানন্দা / পরাগ মিত্র

একা এবং একা / পলাশ পোড়ল

অকপট / উৎপলেন্দু পাল

কবিতাঃ

পাতাবাহার: কাচি-কাঁচাদের পাতা

গল্পঃ মুসোনি ও চাঁদ / শৌনক দাস

অরুণ মুখার্জী রোড / অনীক চৌধুরী

কবিতাঃ

সাদা-কালো কথা / উৎপলেন্দু পাল

নদী / রথীন পার্থ মণ্ডল

মুখোশের আড়ালে / মৃন্ময় ভৌমিক

কথা / অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

মন নেই উৎসবে / প্রণব রুদ্র

এই রাত্রিটা / হরিদাস পাল

শিল্পকলার ঘর / কল্যাণ দে

যেখানে বসন্ত আসে না / বন্দনা পাত্র

বাইশে শ্রাবণ / সুব্রত কুণ্ড

কান্না পরিক্রমা / সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

অক্ষৌহিণী / শ্রীমন্ত সেন

সম্প্রীতির কথা / সৌভিক নিয়োগী

গল্পঃ

চাওয়া পাওয়া / শিঞ্জিনী চট্টোপাধ্যায়

রম্যরচনাঃ পুস্তক বিভ্রাট / বিশ্বজিৎ রায়

ক বি তা

শাদ্বল

শুভাশিস চৌধুরী

আকাশের নীলে সাদা মেঘ
হৃদয়ের রাঙা পটে সুর,
চোখে স্বপ্নদৃষ্টি আবেগ
বুকে মগ্ন সৃষ্টি রোদ্দুর,
আমি তাকে শাদ্বল বলি।

আমার সৃষ্টির দুটি কথা-
তোমার সুস্বর গান দুটি,
চোখে চোখ আঁকা মুখরতা-
মুক্ত মনে দিলে নীল ছুটি,
আমি তাকে শাদ্বল বলি।

শাদ্বল সুসবুজ ভূমি,
প্রতিশ্রুতিময় আমি-তুমি,
প্রতিভার সপ্রতিভ গান,
অঘ্রানের নবান্নের ধান।

যতো দূর চোখ যায় মেলে-
দু-হাত বাড়িয়ে কাছাকাছি –
এসে যদি বলো, ভালো আছো
গিয়ে যদি বলি, ভালো আছি,

এ জীবন শাদ্বল, সবীজ,
এ জীবন শাদ্বল, সজীব ।

আঙুলে আঙুল

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

অন্ধকার খুঁড়ে যাই   শিকড় ছড়াই নিরাশ্বাসে
জীবনের উল্টোপিঠে   আকর্ষ বিছিয়ে দিই
টেনে আনি ভয়   মাথা গুঁজি রাত্রিছায়াঘরে

উঁকি মারে দিন   উঁকি দেয় ফুল পাখি
আলোর স্পন্দন জাগে   প্রাণ সাড়া দেয়
এ বিস্তীর্ণ অন্ধকারে   আশা জাগে, চুপকথা কয়

অন্ধকার আলগা হলে   ধূসর দিগন্ত কোল পাতে
হেঁটে যাই ক্লান্ত পায়ে   কোথাও পথের শেষ নেই
চলেছি কোথায় কে বা জানে   চলেছি অসীম শূন্যতায়

দুপাশের করোটিপাহাড়ে   বুঝি আছে হারিয়েছে যারা,
খুঁজে খুঁজে পাঁজরে পাথর,   বৃথা শ্রম শুধু ক্লান্ত করে
শ্বাসরুদ্ধ শূন্যতার ভার,   ভিতরে আঁধার মেঘ ঝরে

তবুও সামনে কেউ চলে,   দীর্ঘ পথে ঋজু ছায়া ফেলে
সূর্যমুখী চোখদুটো   শেখেনি তিমিরলিপি আজও
সঙ্গিনী আশার হাত   জীবনের হাতে, আঙুলে আঙুল

গূঢ় অন্ধকার

সন্তোষ সিংহ

সমস্ত আলোর ভেতরে থাকে এক রকম গূঢ়
অন্ধকার, থাকে দাঁড়হীন কিছু উদ্ভ্রান্ত যৌনকাতর
কালো নৌকা, যেমন থাকে উজ্জ্বল মেধার ভেতর
কালো দ্বন্দ্বজাত পাড়ার কুচুটে ঝগড়া, থাকে
বলেই সময় অবিনশ্বর, নশ্বরতা নিয়ে মানুষ
জন্মমৃত্যুর চক্রব্যূহ ভেদ করে জেনে গেছে
এই সবুজ পৃথিবীতে ভেড়ার পালই একমাত্র
গনসত্য, আমরা আর কবে ভাঙতে শিখব, আমরা
আর কবে উড়তে শিখব, আমাদের পিঠে ডানা
গজাতে গজাতে প্রবাহ শুকিয়ে যায়, আকাশ
হুড়মুড় করে ভেঙে পরে গোষ্পদে, অজস্র ভঙ্গুরতা
নিয়ে আমাদের আলোর ভেতরে যৌনকাতর
নৌকাগুলো কোনোদিন শিৎকারের স্বাদ পেলো
না, শুধু জন্মমৃত্যুর ভেতরে মুখ গুঁজে অপমান
হজম করে গেলো......

পুরুষ

সেবু মোস্তাফিজ

তালা দেয়া একটা ঘরে
একটা মানুষ একলা মরে
তুমি ভীষণ ঘুমে কাতর
এই ঘরেতে ছিলো বাসর।
লোকটি কখন দিনে দিনে
একলা হলো হাজার ঋণে।
গুনতে থাকে মরার পহর
মিথ্যে ঘটিবাটির বহর।
বাজার ঘাটে সদাইপাতি
রিক্ত করে পুরুষ জাতি।
কলুর বলদ নিত্যি খাটে
এ সংসারের বিরান মাঠে।।

বুঝিস না তুই বুকে ক্ষত
রক্তক্ষরণ অবিরত
ফোটায় হাসি তোদের মুখে
কষ্ট পুষে নষ্ট বুকে।
বুকে যে তার ছিদ্র হলো
বৈদ্য কোথায় পথ্য বলো
অস্ত্রোপচার করতে হবে
বুঝতে তুমি পারবে তবে।
রাত পোহালে সকাল এলে
ওই ঘরে এক পুরুষ মেলে।

ইদানিং

শৈবাল মজুমদার

আশেপাশে পাখিগুলো ভীষণ অপরিচিত
কেউ আর গান গায়না
আশেপাশে বৃক্ষেরা শরীরে সবুজ মুছে
প্রাচীণ প্রেতের মতো প্রশ্বাসহীন
আশেপাশে মানুষের সাজানো মুখের নিচে
গজদন্তে ফিসফিস হাসি
ইদানিং এভাবেই প্রেমঘৃণা পাশাপাশি
মুখোশের মুখ ঢেকে নতুন মুখোশে
শুধুই পালিয়ে যায়...ক্রমশঃ নিজের থেকে
দূরে বহুদূরে মানুষের পদচিহ্নহীন
কোন এক উষর মরুর বুকে সুন্দর সাজানো খাঁচায়
ম্লান মুখে মেছেতার দাগ লাল নীল রঙে ঢেকে
জনমের কোন অকরুণ পরিহাসে...মানবজনম
আশেপাশে নিরন্ন শিশুর স্রোতে উজান সাঁতরায়
আশেপাশে ইদানিং
কে ও কাহারা যেন ভীষণ অপরিচিত সুরে
কি যেন বলতে চায়
ইদানিং আমি তাই সতর্ক পাহারা দিই সারারাত
আমিই পাহারা দিই আমার আমিকে

অঘ্রানে হীরক শিশিরে

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দগ্ধ সময় নিয়ে পড়ে আছি
নিরেট আকাশ নির্দায় শায়িত উপরে -
নদীর কাছে বলি একান্তের কথা
প্রতি বিন্দু তারও ব্যস্ত ক্ষিপ্রতায়
পাহাড়ও যেনো অহংকারে আরূঢ় সমাহিত
আমার সব চিৎকার ফিরিয়ে দিচ্ছে
আমারই দিকে - তিনটি গিড়িখাতে শুধুই অট্টহাসি
জায়মান খরস্রোতা টেনে নিচ্ছে সে প্রতিধ্বনি
পাথরে-উপলে যা কিছু বলা তাও-ও তো দু-খান

ছুটে গেছি সমুদ্রের বুকে শঙ্করপুকুরে,
নেপলস সাগরে বাইয়ায় নিমগ্ন রোমান শহরে
ক্যাপরির মুগ্ধ চাঁদের দেশে সময়ের ঘাম নিয়ে-
জলের উপড় পুড়ে গেছে কথার ফসফরাস
আমাদের কথাগুলো গধূলির ধূলি- রক্তিম বিসর্জন
খালাস করছি কাঠকয়লার বগি অঙ্গার বিয়োজনে

এই নিরালোক দেশে মিসিলের মুখ ভেঙে দিচ্ছে বর্গিরা
জামুনের ডাল থেকে ভেঙে পড়ছে রাশ রাশ পাখি
হিরোসিমার শিরায় ফ্যাটম্যানের দাপটের মতো
বাতাসে বায়বীয় ত্রাস- কাড়ে বুকের নিঃশ্বাস

মৃতেরা ভাসছে গঙ্গায়- দাহ-দাফনের নেই দায়
মরলে কে না জানে- কথা শেষ,শেষ আবদার
যারা গড়েছে বিষযোনি বায়োসন্ত্রাস রক্তবীজের অভিপ্সায়
তাদের তো খোলাবাজার, আমাদের ফাঁকা কলশি লকডাউন
কপ্টার নামে একুশ তালায়, আমাদের নিঃশ্বাসে কাউন্টডাউন

এসব কথা এ সময়ের সশব্দ প্রপাতে মৌন হাহাকার
কচি আঙুরের পাতার স্বপ্ন নিরর্থক জীবাশ্ম-অঙ্গার ।
প্রকৃতিকে ভেঙে দাও লোভী গবেষক- লম্পট বিজ্ঞানী?
ভেঙে দাও সামাজিক সেতু? জল-বায়ু রৌদ্র হননকারী?
ঘাসের জীবন জেনো তবু অনন্তে গজাবে সৃজনী মুকুলে
কেটে দেওয়া সামাজিক সুতো জুড়ে যাবে আদিগন্ত কালে
শুধু সময়ের চেতন বাকলে এ নখদন্তের ছাপ ইতিহাস হবে
আলোর উৎসের কাছে এই সব বাসি কথাই রেখে আসি-
জ্যোতি-জ্যোৎস্নায় নদী পাহাড় জলের অন্তর আলোকিত হবেই
মরকের ওপারে অঘ্রানে হীরক শিশিরে কোনো মনিষায়।

উদযাপন

পার্থ সারথি চক্রবর্তী

স্তব্ধতার নিজস্ব উচ্চারণে মুখরিত
ধানগন্ধী প্রকৃতি, নিঃসঙ্গ আলপথ।
প্রিয় মানুষের চলে যাওয়া নিস্পৃহচোখে দেখা-
নীরবে আদিম ইতিহাসের বিবর্তনের হাতছানিকে
হেলায় উপেক্ষা করে আজ চিরসন্ন্যাসী।

শিশিরভেজা বাতাস থেকে আবছা সকাল,
ভাসমান মেঘরাশি থেকে ঘোলাটে সন্ধ্যা-
মাঝবরাবর এক ঘাসহীন প্রায়রুক্ষ ফালি
যেন এক শীতের রোদ্দুরপোহানো দুপুর।

এই আল্পনা ঘিরে রেখেছে গতিবিধি
সুদূর প্রত্যাশী চোখে শুধু বিস্ময় মাখা,
যজ্ঞের আগুনের লেলিহান শিখায়-
কেবল জীবন সেঁকে নেওয়া, আর আকাশ দেখা।

পলাশের পাপড়ি

সঞ্জয় সোম

আমাদের অনেকে এখন বাঘনখ লুকিয়ে রেখেছে
রাস্তা চিনে তাদের চিনেছি

পূর্বজন্মের কথা জানি না
আমাদের বেঁচে থাকা ইহ জন্মে

নিজের অনুভব নিয়েছি শ্বাসমূলে
লিখে রাখি নিজের ইচ্ছেদের

কে কোথায় কখন লুকিয়ে রাখে একাধিক তীক্ষ্ণ বাঘনখ
নীরবতায় শিখেছি তাদের

আমি প্রত্যেকটি বৃষ্টির ফোঁটায়
রক্ত পলাশের পাপড়ি দেখি

হাসপাতাল

সুবীর সরকার

আর এই ছোট শহরের
হাসপাতালের ভেতর আমি
একা একা ঘুরি
সূর্যাস্তে রহস্য থাকে।
আপেল ও আঙুরের পাশে
তোমার সাজানো দাঁতের পাটি
তোমাকে দেখি না।
কি বোর্ডে তোমার আঙুল দেখি।
আর হাসপাতাল থেকে
বেরিয়ে আসতে থাকে
পেনসিল, লন্ঠন ও দাবার গুটি।

শ্রীরাধিকার নোনাজল

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

চালাঘরে চাল চুইয়ে
বৃষ্টিজলের ছাট
পালিয়ে গেছে সোহাগমাখা
বালাই ঝাটপাট
আয়ান থাকে আউলবাউল
অন্তর উদাসীন
যুবতী রাধা অঙ্গজ্বরে
বাঁশির নেশায় লীন

অন্ধকার

নরেশ মল্লিক

অন্ধকারে জোনাকির আলো
নেভে আর জ্বলে,
স্বপ্নের আনাগোনা শেষ হয়
পড়ন্ত বিকেলে।

মূর্চ্ছিত জীবন উঠে দাঁড়ায়
দুটি ক্রাচে ভর করে ,
গতিশীল জীবন ঠোক্কর খায়
কঠিন শক্ত পাথরে।

জীবনমুখী ধুলো বিস্ফোরণ ঘটায়
দরিদ্রের কুঁড়েঘরে,
দুঃস্বপ্ন আজ জমাট বাঁধে
কালবৈশাখী ঝড়ে।

কোজাগরী ঢাকে ফণির মেঘে
পড়ে থাকে অন্ধকার,
সকালের সূর্যে গ্রহণ মেশে
রক্তাক্ত হাহাকার।

বেলা অবেলা

সজল কুমার দে

সিঙ্গুরের মাটি আজও বন্ধ্যা।
অনুদান নির্ভর সংস্কৃতির চাষবাসে ভরে গোলা।
স্বনির্ভরতার অঙ্কুর বিবর্ণ ঘাসবিষে,
সব সম্ভাবনার ভাঙ্গন শেষে সুজলা সাফল্য।

বসন্ত আসে বসন্ত যায়,
মায়াবী চোখে আজও স্বপ্নের মরীচিকা।
ক্লান্ত অবসন্ন দিন চাপা পড়ে দীর্ঘশ্বাসে।
হাত বেহাত সব অজুহাত ধরবো কাকে ?

তবুও আশায় বুক বাঁধি।
ঈশান কোণে ধীরে ধীরে জমে বৈশাখী মেঘ।
ধুলোঝড় শেষে বৃষ্টির পূর্বাভাস,
কান পেতে শুনি বৃষ্টির গান।

বিসর্জন: মহানন্দা

পরাগ মিত্র

স্মৃতি যায় ঢেউয়ে দুলে সূর্য হেলে এলে
যা ছিল আপন সব জলে ভেসে যায়

না-বিশ্বাসী নতজানু হয় হঠাৎ খেয়ালে
ছলকে ওঠে সান্ধ্য জল আনমনা আজলায়

সেদিনও আকাশ ছিল অভিমানে একা
কড়ি দিয়ে পাওনা শোধ, দহন গেল কই!

হাহাকারের তোর্ষা জাগে মহানন্দার চরে
মা'য়ের বিসর্জন মেনে নেওয়ার দায়।

একা এবং একা

পলাশ পোড়ল

কিছু কথামালা জীবনের বাঁকে ঠিকানাহীন চিঠি
যেভাবে আছি যতক্ষণ অভিমান স্বপ্ন পরিপাটি

উপলব্ধি নিয়ে কথা-বলা জীবন নদীর বহতা
ভেঙে যাও বৃষ্টির সুখে ভেসে ভেসে মৌন মুখরতা।
এই খড়কুটো যুদ্ধ রসদ এই চুপচাপ পাড়াপড়শি
নীল জলে মিশে থাকে একা টোপ-গেলা বড়শি
কোলাহলে নয় কলরবে নয় যে যার মতন খেলা
একলা-আকাশ একলা- ভূগোল একলা- একলা ।
দূরত্ব বাড়ে হিসাব হয় অমিল অমিল সব চুপচাপ
অজানা স্পর্শ তোমার ওম্ কবোষ্ণ উত্তাপ
এই যদি মেঘ সজল সজল নয়ন ছুঁয়ে অন্যকোলে
একাই ভাসি স্বপ্ন ভাসাই পুরনো ক্ষত মুছব বলে।

অকপট

উৎপলেন্দু পাল

আসলে কিছু বলবার নেই
খসখসে পাতায় লিখে যাই মুখ গুঁজে
একরাশ পরাবাস্তব শূন্যতা ,

আসলে কেউ শোনবার নেই
নিস্তরঙ্গ বাতাসে ছুঁড়ে দিই চোখ বুজে
রাশি রাশি দিকভ্রষ্ট স্তব্ধতা ।

পা তা বা হা র

কচি-কাঁচাদের পাতা

গল্প

মুসোনি ও চাঁদ

শৌনক দাস

একদিন এক ইঁদুর দেখল একটা বড় বেলুন উড়ে যাচ্ছে। তার বড় আনন্দ হল। সে ভাবল আমিও যদি এরকম যেতে পারতাম। তখন সে ঠিক করল আমিও একদিন এরকম বেলুন চড়ে উড়ে যাব। ইঁদুরটার নাম ছিল মুসোনি। মুসোনি এরপর যেখান থেকে পারত তার দাঁত দিয়ে কেটে কেটে কাপড়ের টুকরো, প্লাস্টিকের টুকরো তার ঘরে এনে জমা করতে লাগল। অনেক জমা হলে মুসোনি তারপর গাছের আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরী করল একটা বিরাট বেলুন। তারপর সেই বেলুনে করল নিজের বসার জায়গা। ছাদে নিয়ে সেই বেলুন যেই ফুলিয়েছে অমনি সেই বেলুন উড়তে শুরু করল। মুসোনি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সেই বেলুনে।

বেলুন তো সমানে উড়েই চলেছে উপরের দিকে। এদিকে রাত হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে আকাশে। তখন চাঁদ এক মস্ত বড় প্লেটের মত ছিল। কোনো

দাগ ছিল না তাতে। মুসোনি বেলুনে উড়তে উড়তে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। চাঁদ তো দেখে অবাক। এতটুকু ইঁদুর কি করে এরকম বেলুনে চড়ে মহাকাশে চলে এল।

চাঁদ মুসোনিকে জিঞ্জেস করল, তুমি কোথা থেকে আসছ?

মুসোনি উত্তর দিল, পৃথিবী থেকে।

চাঁদ জানত পৃথিবীর মানুষেরা তার কাছে পৌঁছানোর জন্য অনেক কিছু বানাচ্ছে। তাহলে এটা সে রকম কিছুই হবে। মানুষেরা প্রথমে আসে না। অন্য প্রাণী পাঠায়। ওরাই হয়তো ইঁদুরকে পাঠিয়েছে।

চাঁদ তাই ইঁদুরকে বলল, তোমাকে বুঝি মানুষেরা পাঠিয়েছে?

আরে না না। আমিই এসেছি। মুসোনি হাসতে হাসতে বলল।

চাঁদ ভাবল মুসোনি তাকে কিছু লুকানোর চেষ্টা করছে। সে তাই বলল, তুমি কেন মিথ্যা কথা বলছ? আমি জানি মানুষরা তোমাকে পাঠিয়েছে।

মুসোনি বলল, না আমি এই বেলুনটা নিজে বানিয়ে উড়ে এসেছি এখানে।

এবার চাঁদ আর মুসোনির মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া।

চাঁদ বলল, তুমি এত বড় বেলুন বানাতেই পার না। আমাকে প্রমাণ দেখাও।

মুসোনি একটু চিন্তা করে বলল, দেখাতে পারি কিন্তু তার জন্য তোমার পিঠে চড়তে হবে যে। অনুমতি দিলে দেখাই।

চাঁদ অনুমতি দিয়ে দিল এইভেবে এইটুকু ইঁদুর তার আর কী ক্ষতিই বা করবে।

ইঁদুর এদিকে চাঁদের পিঠে চড়ে তার ছোটো ছোটো দাঁত দিয়ে চাঁদকেই কুটি কুটি করে কেটে ফেলল। চাঁদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চাঁদের তখন সে কি কান্না। বলল, ভাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছে তুমি আমাকে জুড়ে দাও।

মুসোনি খুশি হয়ে বলল, আমিও মুসোনি তখন জিভ দিয়ে জুড়ে দিল চাঁদের টুকরোগুলোকে। এত নিঁখুত জুড়ে দিল যে চাঁদ আবার আগের

মতই গোল হয়ে গেল। ছোট টুকরোর জোড়াগুলো কিছুই বোঝা গেল না কিন্তু বড় টুকরোর জোড়াতে দাগ হয়ে গেল। চাঁদ তাতেই বেজায় খুশি। মুসোনিকে বলল, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করলাম। তুমি সত্যিই খুব প্রতিভাবান আর সাহসী। আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই।

তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাই। আমি এখন পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি। আর প্রতি পূর্ণিমার রাতে আমি খোলা মাঠে এসে দাঁড়াব আর তোমার সাথে কথা বলব। তারপর থেকে প্রতি পূর্ণিমা রাতে মুসোনিকে দেখলে চাঁদ খুশিতে হেসে ওঠে তারপর অনেক রাত অবধি দুজনের গল্প হয়। একজন আরেকজনের খোঁজখবর নেয়।

চাঁদের দারুন ব্যাপার না!

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। মুসোনি বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তার নাতি নাতনিরা বড় হলে মুসোনি তাদের কাছে বেলুন নিয়ে কাছে যাওয়ার সব গল্প বলল। চাঁদের সাথে বন্ধুত্বের গল্প বলল। নাতিরা এই কথা বিশ্বাস করল না। পরের পূর্ণিমায় মুসোনির সাথে তারাও গেল মাঠে। কিন্তু সেদিন ছিল মেঘলা, তাই চাঁদ মেঘে ঢেকে রইল। পরের পূর্ণিমাতেও এরকম কিছু ঘটল। এদিকে নাতি নাতনিরা তো অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তারও পরের পূর্ণিমাতে চাঁদ তো উঠল কিন্তু চাঁদের ছিল শরীর খারাপ তাই মুসোনির সাথে কথা বলতে পারল না। নাতি নাতনিরা দাদুর কথা আর বিশ্বাস করল না।

মুসোনি এদিকে চিন্তায় পড়ে গেল কি হল চাঁদের? কোনো অসুবিধায় পড়েনি তো সে। মুসোনি ঠিক করল আবার সে যাবে কিন্তু এবার একা নয় নাতি নাতনিকে নিয়ে। তারপর প্রবল উৎসাহে তিনজন মিলে আবার একটা বড় বেলুন বানাল। আর এক দিন তাতে চড়ে বসল তিনজনে। উড়ে গেল চাঁদের কাছাকাছি। চাঁদ তো মুসোনিকে দেখে আবার খুব খুশি। মুসোনি বলল, আমি আমার নাতি নাতনিদের এনেছি ওরাও তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। চাঁদ বেজায় খুশি হয়ে গেল। ওরা ফিরে আসলেও, তারপর থেকে প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদ ওদের তিনজনকে দেখলেই হেসে ওদের সাথে গল্প করে।

গল্প

অরুণ মুখার্জী রোড

অনীক চৌধুরী

ইনোভার দরজাটা বন্ধ করে, শার্টের সবচেয়ে ওপরের বোতামটা খুলে, সিটে চটপট বসে পড়ে এসি-টা অন করে দিল অভীক। সারাদিন অফিসের এ ঘুপচি কেবিনটায় গায়ে না লাগার সমান হাওয়া দেওয়া ফ্যানের নিচে বসে এ্যাসাইনমেন্ট চেক করা ও ল্যাপটপে অনলাইন মিটিং করে কোনোমতে অফিসের বাইরে যখন অভীক পা রাখলো, তখন ছটা বাজে। সূর্যিমামাও ততক্ষণে দিগন্তে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে নিকটবর্তী রেস্টুরেন্টের দিকে যখন গাড়িটা প্রতিদিনের মতোই নিয়ে যাবে ভাবছে তখনি একটা কথা মনে পড়ে মেজাজ ভালো হয়ে গেল অভীকের। আজ অনুপমা ও তিতিরের বাড়ি ফিরে আসার কথা। গত সপ্তাহে অনুপমা একরকম জেদ করেই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়- অনেকদিন হলো বাড়ি যায়নি তাই। আজই ফিরবে বলেছিল। অভীক সঙ্গে সঙ্গে কল করলো অনুপমাকে ।

'হ্যালো, অনুপমা, বাড়ি চলে এসেছ?'

'না, গো! আজ আসতে পারব না। সবাই আটকে দিল, বললো, কালকে ফিরে যেতে।'

'ও...ঠিক আছে। তিতির কি করে?'

'নিজেই কথা বলো!'

এই বলে অনুপমা ফোনটা এগিয়ে দিল ছোট্টো তিতিরের মুখের সামনে। মাত্র তিন বছর বয়স ওর! তবে এর মধ্যেই কথা বলা শিখে গেছে। অনুপমা ফোনটা এগিয়ে দিয়েই বলল, 'এই যে পাপা, কথা বলো।'

'হ্যালো পাপা।'

'হ্যালো মা, কি করো?'

'আমি খেলি।'

'কার সঙ্গে?'

'মা আর মামার সঙ্গে'

'ও মা!তাই?'

'হ্যাঁ মামার সঙ্গে গাড়ি গাড়ি খেলি!'

'আচ্ছা এবার মাইয়ের সঙ্গে কথা বলি।টাটা তিতির!'

'টাটা পাপা'

ফোনটা কানে দিয়ে অনুপমা বলে, 'হ্যাঁ,বলো।'

'বলছিলাম...কাল দেখে শুনে চলে এসো, রাখি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে'

ফোনটা রেখে রেস্‌টুরেন্টের দিকে গাড়ি নিয়ে গেল আভীক। রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে গত সপ্তাহের অন্য দিনগুলোর মতো খাবার প্যাক করে বেরিয়ে এলো রেষ্টুরেন্ট থেকে। সবার মাঝে একা বসে খাওয়ার চেয়ে, আরাম করে টিভির সামনে বসে খাওয়াটা ঢের ভালো বলে মনে করে অভীক। খাবারটা পাশে রেখে, সিট বেল্ট বেঁধে, অ্যাকসেলেটররে চাপ দিতেই গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ এ গলি ,ও গলি করার পর ইনোভাটা অরুণ মুখার্জী রোডে এসে পড়ল।প্রকান্ড রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে দোকান-পাট বসেছে, মাঝখান দিয়ে ব্যারিকেড!

এমনিতে এ অঞ্চল এখনও মফস্বল এলাকা, তার ওপর আজ রোববার। তাই রাস্তা এক্কেবারে ফাঁকা ধু-ধু মাঠ।

মাঝে মধ্যে দু-এক জন লোক রাস্তার পাশ দিয়ে হেটে বা সাইকেলে করে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক চলার পরই অভীক দেখল, বেশ কিছুটা দূরে- রোডের বাঁদিকে অর্থাৎ যে দিক দিয়ে অভীক যাচ্ছে সেদিকেই বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে। কি ব্যাপার! কোনো দাঙ্গা হলো নাকি? না তাহলে বেশ হই-হুল্লোড় শোনা যেত। ওখানে তো সবাই শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য এগোতেই অভীক বুঝতে পারল, কোন জিনিসকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। তবে কি... কোন অ্যাক্সিডেন্ট? তাই বোধহয়। যখন অভীক ব্যাপারটা বোঝার জন্য গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল এবং গাড়ি থামিয়ে কি হয়েছে দেখতে যাবে ভাবল, তখনই একটা ভয়ানক চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল। 'আচ্ছা যদি এ লোকজন গুলো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া লোক গুলোকে আমার গাড়িতে তুলে দেয়? তাহলে তো সে আর এক ঝামেলা! রক্তে মাখা এ মানুষগুলোকে গাড়িতে তুললে গাড়ি তো নোংরা হবেই-ওদের হাসপাতাল পৌঁছে দিতে হবে! ধুর, কে করতে যায় ওসব? নিজের আপদ নিজে ডেকে আনা!- মনে মনে ভাবল অভীক।

আমাদের অভীক চিরদিনই এসব কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে। পালিয়ে বেরিয়েছে নিজের বিবেকের কথা তুচ্ছ করে এবং আজও তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটলো না। গাড়ির স্পিড আবার বেড়ে গেল। অভিকও চলে গেল ওর মতো। ওর সভ্যতা বাঁচিয়ে, শালীনতা বাঁচিয়ে, ওর সম্মান বাঁচিয়ে! পেছন থেকে লোকেরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিল, 'ও দাদা!ও...দাদা...দাঁড়ান,দাঁড়ান! একটু হেল্প করুন...।'

বাড়ি পৌঁছেই ফ্রেশ হয়ে নিল অভীক। প্যাকেট খুলে খাবারগুলো যখন প্লেটে ঢালছে, তখন ওর মুঠোফোনটা বেজে উঠল। অভীকের শাশুড়ি-মার কল। ফোনটা তুলতে মধ্যবয়স্ক গলায় একটা প্রশ্ন শোনা গেল,' অভিক, বলছিলাম অনুপমারা পৌঁছেছে?!

' অনুপমা তো কাল আসবে বলল।'

'অনু আসলে আজকেই বিকেলে রওনা দিয়েছিল। তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে বলে। তোমাকে কিছু জানায়নি।ও কি তার মানে এখনো পৌঁছয়নি ?'

'না…'

'ও..ঠিক আছে ।এখনই পৌঁছে যাবে। রনিকে পাঠিয়েছি সঙ্গে ,বুঝলে।'

'আচ্ছা মা, ঠিক আছে।'

ফোনটা কেটে দিলে অভীক। দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল, তবে এখনো পৌঁছলো না অনুপমা । অভীকের মনে নানা দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধতে থাকলো। মনে মনে ভাবতে থাকলো-' কি ব্যাপার, ওর বাপের বাড়ি থেকে এখানে আসতে তো বড়জোর দু-ঘন্টা লাগার কথা। তাহলে এখনো পৌঁছলো না কেন? রাস্তায় তো জামও নেই! রাস্তায় কি কোনো দুর্ঘটনা…? নাঃ, কি সব ভাবছি! আসলে বোধহয় কিছুই হয়নি। বেকারে চিন্তা করছি।' কিন্তু দুশ্চিন্তা ওকে ছারল না। অনুপমাকে কল কর সে। একবার নয়, দুইবার নয়, আনেক বার। যতবারই করুক না কেন একবারও কল রিসিভ করলো না অনুপমা। রনিকে কল করলো সে। এবারও একই। - 'তাহলে কি সত্যিই…', ভাবলো সে।

এমন সময় একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল এলো। রিসিভ করতেই অভিক বলল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'হ্যাঁ, নমস্কার। আপনি অভীক দাস তো?'

'হ্যাঁ, আপনি কে?'

'আমি টাউন হসপিটাল থেকে বলছি।'

হঠাৎ অভীকের বুকে যেন কেউ এক হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলো।

'আপনি এখনি হসপিটাল আসতে পারবেন!' আপনার বাড়ির লোকেরা এখানে...।' অভীকের হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেলো। তক্ষনি হসপিটালে ছুটলো সে। পৌঁছে সোজা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। ডাক্তারবাবুর কাছে সে জানতে পারলো যে শুধু যিনি ড্রাইভ করছিলেন অর্থাৎ রনিই

একমাত্র বেঁচে আছে। হসপিটালের বেডে রনির সঙ্গে দেখা করল সে। ঘাড়ে আর হাতে

সামান্য ইনজুরি হয়েছে তার। রনি বলল 'দিব্যি ড্রাইভ করছিলাম দাদা, হঠাৎ একটা ট্রাক এসে…!'

রনির পাশ থেকে বেরিয়ে একটা লোক এসে অভীককে বলল,'আপনি কি ওদের লোক?'

অভীক কোনমতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি লোকটির জামাইবাবু হই।'

'কি বলব দাদা অ্যাকসিডেন্ট হওয়া মাত্র অ্যাম্বুলেন্স কল করি। আপনি তো জানেনই ওদের আসতে আসতে এক ঘন্টা। আশা করছিলাম রাস্তায় একটা না একটা গাড়ি তো পেয়ে যাব। কিন্তু পোড়া কপাল, অনেকক্ষন হয়ে গেলেও রাস্তায় একটাও গাড়ি আসল না। শেষে দেখি একটা ইনোভা আসছে। কতো ডাকলাম দাদা। কিন্তু কোন পাত্তা না দিয়ে চলে গেল। যদি ওই গাড়িটা আজ থামতো, তাহলে হয়তো আপনার স্ত্রী এবং ছোট্ট শিশুটি বেঁচে যেত।'

'কোথায় হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টটা?'

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল আভীক।

'অরুণ মুখার্জী রোড।'

ক বি তা

সাদা-কালো কথা

উৎপলেন্দু পাল

আমার ইতিহাসের পাতায় চিরকাল শুধুই রক্তক্ষরণ লেখা থাকে
আমার ভূগোল জুড়ে শুধুই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কাঁটাতার
আমার সাহিত্যে আমার বুকের ক্ষতগুলি বরাবরই অবগুন্ঠিত
আমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে বাসা বাঁধে এক ধর্মান্ধ অন্ধকার ।

তবুও আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই দিগন্তবিহীন এক পৃথিবী
আমার আদিম বসতভিটায় হামাগুড়ি দেওয়া জীবনের অভিযান
সহস্র লেলিহান চিতায় শায়িত পূর্বপুরুষের অভিমানী মুখচ্ছবি
আর এক জাত - ধর্ম - বর্ণহীন উদার মানবতাবাদের উত্তরাধিকার ।

নদী

রথীন পার্থ মণ্ডল

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে
জীবননদীর পথে চলতে চলতে
একদিন শেষ হয় খেলা
তারপর আর বাজে নাকো কৃষ্ণের বাঁশি
শোনা না শোনার আড়ালে থেকে যায়
কিছু না বলা কথা -
এখনও সন্ধ্যা নামে সময়ের বুকে
তোমাকে নিয়ে এখনও কিছু
লেখা হয়নি আমার
তোমাকে আজও খুঁজে বেড়াই
নদীর আঁকে বাঁকে।

এখনও আমার মনে পড়ে
তোমার ভালোবাসা মাখা হাত
যে হাত একদিন থেমেছিল নদীজলে
ঢেউ তুলেছিল নদী
তারারা জ্বেলেছিল আলো।
চাঁদনি রাতে নদীর কোলাহল

বুক ভরা ভালোবাসা আজও ঠাঁই করে দেহমনে।
এখনও শুয়ে থাকি নদীর বুকে
নৌকার মাঝে অন্ধকারে
পথ চলা আমার - চলেছি আজও
তুমি তারা হয়ে জেগে থাকো আমার সাথে।

মুখোশের আড়ালে

মৃন্ময় ভৌমিক

খোলস ছেড়ে বেড়িয়েছে
মূর্তিমান বিভিষিকা,
রণদুন্দুভি বাজে ঐ,
কে পড়াবে নীতির পাঠ...
নাচে ভৈরব, উন্মুক্ত অসি,
মানবিকতা কৈ।

এ যে এক অশনিসংকেত চারিদিক,
উদভ্রান্ত সকলে, মুখোশ মানবিক।
মুখোশের আড়ালে শান্তির কথা বলে,
সভ্যতা পিষে মরে ধর্মের জাঁতাকলে।

কথা

অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ...
কত না যুগ যুগান্ত ধরে চলছে কথা বলা।
কথা তো শুধু কথা নয় এ যে জীবনগীত।
কথা তুমি সুখ ,
কথা তুমি দুঃখ,
কথা তুমি বিরহ,
কথা তুমি আনন্দ।
কত না ব্যাথা ভরা রাতের যন্ত্রনা তুমি
কত সুন্দর নিবিড় মুহুর্তের সাক্ষী তুমি
কত নীরব ভলোবাসা নিয়ে আছো তুমি!
কথা তুমি প্রেম,
কথা তুমি ঐশ্বর্য,
কথা তুমি শান্তি,

কথা তুমি তৃপ্তি।
অনাদি কাল থেকে কালান্তরে চলেছ
হৃদয় হতে হৃদয়ে বয়ে যেতে যেতে
সাত সমুদুরের পাড়ে পৌঁছে গেছো তুমি।

কথা তুমি স্বপ্ন,

কথা তুমি আকাশ

কথা তুমি কাকলি,

কথা তুমি কথা।

সাগরের ঢেউয়ে ভাস তুমি

হাওয়ায় হাওয়ায় কলতান তুমি

অরণ্যের গহন গভীরতাতেও তুমি।

কথা তুমি কামনা

কথা তুমি বাসনা

কথা তুমি মোহ

কথা তুমি মায়া।

উচ্ছল প্রাণের উৎস তো তুমি

জীবন লহরীর শেষ কথা তুমি

প্রকৃতির নীলিমায় লীন যে তুমি।

মন নেই উৎসবে

প্রণব রুদ্র

ছেঁড়া জীবনকথায় বন্ধু, শেল জমাট বুকেতে

কেমনে যাই আমি, নতুন পোশাকে ঘুরিতে?

কিভাবে মাগো উৎসবে স্রোতে তাথৈ নাচি?

প্রতিবেশির জ্যান্ত কষ্টেও, শান্ত সুখে বাঁচি!

মা, মাগো, আমায় দে তুই আজ যাদুদন্ড আনি
ভরাবো মন সবার আমি, লুটে দুঃখখানি।

এই রাত্রিটা

হরিদাস পাল

এই রাত্রিটা আমার বেশ চেনা-
প্রায়ই চলে আসে, জেগে থাকে
ঘুম ভাঙা পাখির মতো।
জানালা খুলে দিই,
যে ক'টি তারা দেখা যায় গনি,
মনের কথা বলি তাদের সাথে।
আজ কী হলো একটি তারাও নেই,
দূরে একটা পাখির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
ও কি আমাকে ডাকছে?
যাই কেমনে ! রাত্রি পাহারা দিচ্ছে।
না, ওর শব্দ টেনে নিতে পারলো না।
জোনাকিরা মিটিমিটি জ্বলছে, কয়েকটি

শব্দ অক্ষর পাশে এসে বসলো, ওদের ভাবছি।

ভাবতে ভাবতে রাত্রি চলে গিয়ে

ভোর পাঠিয়ে দিলো।

ভোর এখন ভাবছে

সকাল দিনটা কেমন যাবে।

দুধের শিশুটি মার বুকে কাঁদছে,

শুকনো বুকে কাঁদছে।

শিল্পকলার ঘর

কল্যাণ দে

ঘুড়ি ওড়ালেই আকাশ ছোঁয়া ডুমুরের ফুল --

কুলকুল ঝরনা যদিও পায় সাগরকূল

আকুল বাসনারা যেন বাউলের একতারা

ধারা নামিয়ে ঝরনা চোখে আনে সূর্যমুখী মুকুল

ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে একদিন ছোঁয়া যায় মেঘ

বেগে হাওয়া বইলেও রাগ কমে না

ছবির পর ছবি সাজিয়ে অদৃশ্য শিল্পী

বানিয়ে ফেলে শিল্পকলার ঘর - - - -

যেখানে বসন্ত আসে না

বন্দনা পাত্র

আকাশে সূর্যের বন্যা নিচে সমুদ্রের স্রোত,
বালির চরে কৃষ্ণচূড়া আবীর মাখেনি -
দূরে ঝাউবনে ময়ূরীর দীপ্ত নৃত্য;
পীত বর্ণের স্মৃতি ঢলে পড়ছিল সেদিন -
যেদিন বসন্ত আসেনি -
তোমার দু-চোখে দেখি সমুদ্র স্রোত
যেখানে কখনও বসন্ত আসে না।
সূর্যের বন্যায় সমস্ত আকাশ ঝ'রে
তোমার দেহে কী উত্তাপ! তুমি কাঁদো,
বাসি ভাত দু-মুঠো বসন্তের কথা বলে না।
সাহসী হৃদয়ে উদ্দাম বসন্ত জ্বলে যায়
জন্মান্তরের কথা জাতক কথায় -
কষ্ট সহ্যের পর আবারও কি জন্ম হয়?
তোমার? আমার? আর একাকী জীবনের?
মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যারা, তাদের বসন্ত...?
না, আসে না, তাদের বসন্ত আসে না।
উতলা যৌবন হৃদয় ভরা প্রেম -
আবীর রঙা গোধূলি ফিরে যায়
দূরে আকাশের দেয়ালে গাঢ় শূন্যে।

বাইশে শ্রাবণ

সুব্রত কুণ্ড

এনেছে শ্রাবণ দুখের লিপিকা ...
বেদনার বরিষণ,
তোমার গানের সুগহন সুরে
কাঁদে মন অনুখন।

চারিদিকে আজ মূক হাহাকার ...
কাছে নেই আর তুমি,
তোমার প্রাণের গৌরব গাথা
ভোলেনি ভারত-ভূমি।

বাইশ আমার মনের ভিতর
বাইশ জগৎ-মনে,
ব্যথার বাদল ভিড় করে দেখি
সবার নয়ন-কোণে।

যে দিকে তাকাই তোমার রচনা,
গান, কবিতার ধারা,
প্রাণের আরাম মনের হরষে
হয় যেন ধ্রুবতারা।

কান্না পরিক্রমা

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

(Every strong people cry at night)

কাঁদি আমরা গহন মধ্যরাতে -
স্বপ্নগুলো উড়ে গেলে বেবাক শূন্য হাতে
চোখের জল আড়াল করে বলি
উড়ে এলো ঝড়ের ধুলোবালি।

কাঁদি আমরা নিঃস্ব মনের ঘরে
হতাশা আর শূন্য হাহাকারে
কাঁদিনা কেউ ব্যস্ত কোলাহলে
চোখ মুছে নিই আলতো ঠান্ডা জলে।

এক পেয়ালা আশা কাচের ভালোবাসা
ভেঙে গেলেই টুকরো আবর্জনা-
ঘুমের মধ্যে হাতড়ে খুঁজে ফিরি
চোখের জলে যায় ভেসে বিছানা ।

কে কাঁদেনা? সবাই কাঁদি নিজের মতো করে
শুধু কান্নাগুলো লুকিয়ে রাখি হাসির অগোচরে

অক্ষৌহিণী

শ্রীমন্ত সেন

শুধু অক্ষর সাজালেই কবিতা হয় না
শুধু শব্দের বগল বাজালেই যুদ্ধ হয় না
কিছু ঘাড়-উঁচু ভাবকে অস্পৃশ্য রেখে
কিছু নিরাপদ ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে
কবিতার আদেখলাপনায়
না ইচ্ছামতী নদীতে জল বয়ে যায়
না আমাজন নদীতে রক্তের স্রোত

নিরাপদ দূরত্বে নয় যদি কোনও দিন
কবিতাকে নিয়ে যেতে পারি
রক্ত-ঘাম-ধুলো-ধোঁয়া-অপমান-ক্ষত,
বিবিক্ত হাহাকারের কাছে
প্রতিটি শব্দে মাখাতে পারি মনখারাপির স্পর্শ
ভাবে ও অভাবে, সাম্যে ও অসাম্যে হয় চোখাচোখি
সেদিন অক্ষরেও ফুটবে যুগাশ্বের হ্রেষাধ্বনি
সেদিন কবিতাও হয়ে উঠবে অক্ষৌহিণী।

সম্প্রীতির কথা

সৌভিক নিয়োগী

সত্য আর সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা
হবে না বোধহয় আর !
প্রেমের বাতি,জ্ঞানের আলো
নিভেছে ধর্মের ঝড়ে।
বাঙালির মনে অন্ধকারের ছায়া জাগে,
জ্ঞানের আলো বোধহয়
সাম্প্রদায়িকতার অতলে পৌঁছায় না।
সর্বনাশের ঘণ্টা বাজে
মন্দির ভাঙ্গে ,মসজিদ ভাঙ্গে
মানুষ মরে শয়ে শয়ে।
রাম-রহিমের ছিঁড়েছে সমস্ত মায়াডোর
এখন তারা লড়ে।
রক্তের খেলা বড় ভয়ানক
দুজনেরই ঘর পোড়ে।
উগ্রবাদীরা দূরে দাঁড়িয়ে
আগুন জ্বালিয়ে হাসে।
আঁকড়ে তবু ধরে সবাই
প্রেমের অটুট বাঁধন।

আঁধারের রাশ কাটিয়ে তবেই
শান্তি এবার আসবে ফিরে,
কথা দিলো বাঙালি জাতি।

ছোটো গল্প

চাওয়া পাওয়া

শিঞ্জিনী চট্টোপাধ্যায়

আজকালকার মেয়ে-বউগুলোর সত্যি মোবাইল ঘাঁটা আর সেল্ফি তোলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে গেলো তো সেল্ফি, নতুন ড্রেস পড়লো তো সেল্ফি।বিশেষ করে পূজোর সময় তো কথাই নেই। আগে ফটো-সেশন, তারপরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া। মন্ডপে গিয়েও সেই ছবি তোলা চলতেই থাকে। বিরক্ত লাগে সম্রাটের। সম্রাট একটি রেপুটেড কোম্পানির বেশ উঁচু পোস্টে আছে।

বদলির চাকরির জন্য পরিবারকে ও কোলকাতায় সেটল করিয়ে দিয়েছে। ছেলের পড়াশোনার সুবিধা হয় তাতে। যাই হোক সম্রাটের যা কাজের চাপ তাতে করে ও ওর মিসেসকে সময় দেবে এটা আশা করা অন্যায়। বরং বাড়িতে এসে ঝুটঝামেলাবিহীন একটা জীবন ও কয়েকদিনের জন্য কাটাতে চায়। তখন মিসেসের আবদার মেটানো অথবা তার কোনো ক্ষোভের কথা ধৈর্য ধরে শোনা এবং তাতে প্রলেপ লাগানো এগুলো বড় বিরক্তিকর লাগে। পুজোর ছুটিতে এসে থেকে লক্ষ করে যাচ্ছে ওর মিসেস রিয়া ভীষণ মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা সেজে এক রাউন্ড ফটো সেশন হবে। তারপর ঠাকুর দেখতে বেরোবে। রাতে এসে সেগুলো ফেসবুকে পোস্ট করবে। পরদিন থেকে লাইক, কমেন্ট গুনতে থাকবে, বিরক্তিকর, সত্যি বিরক্তিকর। নবমীর সন্ধ্যায় সম্রাট আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না।

সম্রাট আর ওর এক বন্ধু পরিবার নিয়ে বের হবে ঠাকুর দেখতে। কয়েকটা মন্ডপ ঘুরে ওদের বাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে সম্রাট আর ওর বন্ধু শহরের একটা বারে গিয়ে বসবে। রিয়াদের দশটার মধ্যে বাড়ি ঢুকিয়ে দেবে, কারণ বাড়িতে বয়স্ক বাবা, মা আছেন। ওনাদের রাতের খাবার সময়মতো দিতে হবে রিয়াকে। রিয়া বের হওয়ার বদলে ফটো তুলেই যাচ্ছে কখনো একা কখনও ছেলেকে নিয়ে। সম্রাট মেজাজ হারিয়ে বলে ওঠে ভীষণ অসামাজিক হয়ে যাচ্ছো! তোমার মতো মায়েদের জন্য আজকালকার ছেলে মেয়েরা এতো মোবাইল আসক্ত। যাই হোক বের হতে দেরী হওয়ার কারণে সম্রাট আর ওর বন্ধু একটা মন্ডপে গিয়ে সেখান থেকে সোজা বারে চলে গেল। রিয়া তাদের বান্ধবী এবং ছেলে মেয়েদের নিয়ে মন্ডপে ঘুরে সময়মতো বাড়ি চলে এলো।

রিয়ার মতো একটা অতি সাধারণ মেয়ে বুঝবে না পুজোর আগে কি বিপুল পরিমাণ কাজের চাপ সামলে সম্রাট বাড়িতে এসেছে। বাইরে কতটা মানসিক চাপ সামলে কাজ করতে হয় তা রিয়ার ধারণাতীত। যাই হোক সবাইকে সময়মতো খাবার খাইয়ে রিয়া মোবাইল নিয়ে সবে বসেছে এমন সময় সম্রাট ঢুকলো। সন্ধ্যাবেলার খিটখিটে মেজাজ উধাও। বেশ মুডে আছে। সম্রাটের ভীষণ ইচ্ছে করছে রিয়ার সাথে

সময় কাটাতে। সময় কাটানো বলতে রিয়া কিছু বলবে আর ও সেটা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে সেরকম না। সত্যি কথা বলতে কি পারিবারিক ব্যাপারে সম্রাট খুব কম ইনভল্ভ থাকে। ওর জীবন যাপন অন্য পর্যায়ের। প্রতি মাসে বাড়িতে মোটা অংকের টাকা পাঠায়। কারোর কোনো অভাব রাখে না। এরপরেও যদি বউয়ের মন নিয়ে গবেষণা করতে হয় তাহলে পাগল হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। বাড়ীর ভিতরে আরাম করতে করতে বউগুলো বড় বেশি ন্যাগিংগ্রস্ত হয়ে যায়। বউকে পাশে নিয়ে বসা মানে সম্রাটের চশমা, মোবাইল, জলের বোতল যখন যেটা দরকার রিয়া হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। দরকার মতো স্ন্যাকস সার্ভ করবে। এটাই সম্রাটের কাছে বউয়ের সাথে সময় কাটানোর মানে। সম্রাট দেখল তার বউ আবার মোবাইলে ব্যাস্ত। সম্রাট উষ্মা প্রকাশ করে বললো অসামাজিক!

রিয়া শান্ত ভাবে বললো "সামাজিকতা অনেক বৃহৎ ব্যাপার। আমি অসামাজিক কিনা জানিনা, কিন্তু তুমি নিজে সামাজিক তো? প্রতিটা উৎসবের প্রতিটা দিন তুমি যেভাবে যাপন করো সেটা সামাজিক তো? তোমার ইচ্ছে মতো তোমার সাথে সময় কাটানো, যখন তোমার স্পেসের প্রয়োজন তখন আমাকে উপেক্ষা মেনে নিতে হবে এটা সম্ভব না। সামাজিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা শব্দগুলো শুধু আমার বা আমাদের মতো মেয়েদের জন্য তৈরি বলতে চাইছো? তুমি চাকরী করে ক্লান্ত, আর আমি সংসার সামলে ক্লান্ত না? নাকি তোমার ক্লান্তি, একঘেয়েমি গুলো খুব দামী আর আমার অনুভূতি গুলোর কোনো দাম নেই? সোশ্যাল মিডিয়ার মেকি ভার্চুয়াল দুনিয়াটা আমাকে খানিকক্ষণের জন্য ভাবায় আমি একা নই , আমিও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য; তাই থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠি আর মেক-বিলিফ দুনিয়ায় ঘুরে আসি। আমার জীবনটা তোমার মাপে মাপে সাজানো সম্ভব না।আমি যেমন তোমার অবহেলা মেনে নিয়েছি, সেরকম তোমাকেও মানতে হবে আমারও নিজস্ব দুনিয়া আছে যেখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ। দেওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যালান্স করতে শেখো।"

রম্যরচনা

পুস্তক বিভ্রাট

বিশ্বজিৎ রায়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) উপন্যাস 'অগ্নি'কে অবলম্বন করিয়া অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় যে 'অগ্নিশ্বর' চলচ্চিত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে মহানায়ক উত্তম কুমার একদা বলিয়াছিলেন যে ঘরের বউ আর বই – একবার বাহিরে গেলে আর অন্দরমহলে আসিতে চাহে না। কথাটা যে কতবড় সত্য তাহা আজ হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করিতেছি। দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই বাধ্যবাধকতায় নহে, যদিও (যদিও 'সচ্ছলতা' শব্দটিকে শৈশবে দূরবীন দিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই) এক প্রকার অন্তরের তাগিদেই সংসারে কিছু অবদান রাখিবার নিমিত্ত গৃহশিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

পাঠদানের পাশাপাশি নাবালক ছাত্রের নাক মুছাইয়া, পিঠ চুলকাইয়া, আরো নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া মাসিক সত্তর টাকা আয় করিতাম। সে নব্বই দশকের কথা বলিতেছি। সাংসারিক অবদান বলিতে শুধু চায়ের জন্য যে কয়েকটি টাকা ব্যয় হইবে তাহারই গুরুদায়িত্ব বহন করিতাম। আমার মাতার নির্দেশ ছিল- আমার অর্জিত অর্থ যেন আমি নিজের পড়াশোনার কাজে ব্যয় করিয়া থাকি। মাতৃ আদেশ শীরধার্য্য করিয়া আমি তাহাই করিতাম। কিন্তু এখানেও

বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতাম। দু এক জন ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকগণ টিউশনির টাকা আমার নিকট হইতে লইতেন না। অতএব মাসিক আয়ের গড়ে ৩০-৩৫ টাকা অবশিষ্ট স্বরূপ আমার হাতে পড়িয়া থাকিতো। আমি বরাবরই পড়িতে ভীষণ ভালোবাসি। আমার মনে পড়িতেছে, যে সময় আমরা পরিবারের সকলে মিলিয়া ভাড়া বাড়িতে দারিদ্র্য হেতু একসঙ্গে একটি কক্ষে রাত্রি যাপন করিতাম সেই সময় অধিক রাত অবধি বিনা কারণে আলো জ্বালাইয়া রাখিলে অন্যের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া শিয়রে টর্চের আলো ফেলিয়া আমি গল্পের বই পড়িতাম। তখন বয়স ছিল অল্প। সিদ্ধি লাভের পথ তখনও অবলম্বন করি নাই, এখনও কখনও খুঁজিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। সুতরাং একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে আমি অবশিষ্ট অর্থ দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতাম।

আমাদের পাড়াতে এক জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা সেই সময় মদ, গাঁজা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভের সিড়ি বাহিয়া তড়তড় করিয়া উর্ধ্বমুখী গমন করিতেছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে তাহার বাড়িতে গিয়া দেখিলাম তিনি পুরাতন পুস্তক স্তুপীকৃত করিয়া পুস্তক বিক্রেতাকে পুস্তকগুলি কেজি দরে বিক্রয় করিতেছেন।

আমি বলিলাম, 'এই বইগুলি সব বিক্রি করে দেবে দাদা?' সে কহিল, ' হ্যাঁ, এগুলি আর দরকার নেই । শুধু শুধু ঘর ভরে থাকে।'

আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'দরকার যে কি তুমি তাহা বুঝিবে কি করিয়া?'

আমি পড়িয়াছিলাম ফরাসীরা তাহাদের সারা জীবনের অর্জিত আয়ের প্রায় ১৫% – ২০% অর্থ না কী পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন। আমার এরূপ কথা শুনিলে তিনি হয় তো আমাকে পন্ডিত বলিয়া ব্যাঙ্গ করিতেন। তাই নিশ্চুপ থাকিয়া পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিলাম এবং একখানা মূল্যবান পুস্তক খুঁজিয়াও পাইলাম। তাহা পি.কে.দে সরকার

মহাশয়ের একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরাজি ব্যাকরণ। পুস্তকখানি হাতে লইয়া আমি বলিলাম, 'এই বইটি আমি নিতে চাই।'

তিনি আমার মুখপানে তাকাইয়া, মাথা চুলকাইয়া আমায় বলিলেন, 'টাকার খুব দরকার রে। তুই একটা বই চাইলি আর আমি দিতে পারছি না। নিজেরই বড় খারাপ লাগছে। তুই কিছু মনে করিস না ভাই- ঐ বই আমি বিক্রি করবো।' আমি বলিলাম, 'না,না, বিনা পয়সায় নেবো কেন? টাকা দিয়েই নেবো।' আমার কথায় তাহার মুখে হাসি ফুটিলো। আমার হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইয়া দুইটি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কহিলেন, 'বইটির দাম ২২ টাকা। অর্ধেক দাম হয় ১১ টাকা। তুই কত দিবি?'

এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের নিমিত্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম না । আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি আমায় ভ্রাতৃসম গন্য করিয়া থাকেন, অতএব আমি যাহা প্রদান করিবো তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। যাহা হউক, আমি পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম তাহাতে ৫ টাকা রহিয়াছে । মুখটি কাচুমাচু করিয়া কহিলাম, 'আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে । পাঁচ টাকা দিলে হবে?"

আমি তাহাকে মনে হয় যেন এইবার ধর্ম সংকটে ফেলিলাম। 'না' বলিতে পারিতেছেন না কারণ আমাকে ভ্রাতৃসুলভ(?)স্নেহ করিয়া থাকেন, আবার 'হ্যাঁ'ও বলিতে পারিতেছেন না, আমার নিকট বিক্রয় করিলে তাহার ছয় টাকা লোকসান হইবে। তবে অস্বীকার করিবো না সেই যাত্রায় আমার প্রতি তাহার করুণা উদ্রেক হইলো এবং একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া আমাকে রক্ষাও করিলেন। আমায় বলিলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুই এখন পাঁচ টাকা দে, পরে আবার ৬ টাকা দিয়ে দিবি। পরে মনে করে দিবি কিন্তু। বিদ্যা কখনও বিনা পয়সায় নিতে নেই। 'আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'সত্যই তো, বিনা পয়সায় শিক্ষা লইতে গিয়া একালব্যর কি দশা হইয়াছিল – তাহাতো ভুলিবার নয়।

এত কথা বলিবার একটাই কারণ, তাহা হইলো আমি পুস্তক অনেকটাই কিনিয়াছি এবং অদূর ভবিষ্যতেও কিনিবো। পুস্তক আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা। অতএব পুস্তক বিচ্ছেদ প্রেমিকা বিচ্ছেদেরই সমতুল্য। আমি অভিনেতা স্বর্গীয় উৎপল দত্ত মহাশয়ের বাংলা ভাষায় লিখিত "সেক্সপিওরের সমাজ চেতনা" নামক একটি দূর্লভ পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলাম। সেই সময় পুস্তকটা যত পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি তার শিকি ভাগের শিকি ভাগও না। আমার বন্ধু আজি হইতে প্রায় দশ-বারো বৎসর পূর্বে পুস্তকটি পড়িবার উদ্দেশ্যে যে উৎসাহের সহিত লইয়াছিলেন আজ দশ-বারো বৎসর ধরিয়া পুস্তকটি ফেরাইবার সে উৎসাহের ডেপ্রিশিয়েশন হইতে হইতে বর্তমানে তাহা শূন্যতে ঠেকিয়াছে। তাই পুস্তকটি আমি আজও ফেরত পাই নাই। গতকাল রাত্রে যখন তাহাকে হাতের কাছে পাইলাম তখন এক প্রকার লজ্জা শরম ত্যাগ করিয়া পুস্তকটি দাবী করিয়া বসিলাম। তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বাড়িতে দুইটি কন্যা সন্তান, গৃহিনী, চারটি গরু সামলাইয়া যদি সময় বাহির করিতে পারেন তবে ফোন মারফত আমাকে সুসংবাদটি জানাইয়া দেবেন। সকাল হইতে আমি এ পর্যন্ত আট দশবার ফোন দেখিয়াছি এই কারনে যে তাঁহার ইনকামিং কল ভুলবশত আমার হাত ছাড়া হইয়া যায় নাই তো! কিন্তু কোনো কলই আসে নাই। অতএব বন্ধুগণ আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরমাকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনিতে থাকি।

'শাদ্বল' ই-পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ ১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে এম. এস. ওয়ার্ডে লিখতে হবে। তারপর তা ডক্স ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। পি. ডি. এফ হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। এতে অবশ্য লাইন ফরম্যাট ভেঙ্গে যেতে পারে। জি-মেল বডি বা ওয়াটসঅ্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো এম.এস.ওয়ার্ড ডক্স ফাইল।

2. পাঠাবেন এই জি-মেল বা ওয়াটসয়্যাপ নম্বরেঃ (ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭ (খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

আবার দেখা হবে।

আপনাদের শুভেচ্ছা 'শাদ্বলের'

চলার পথের পাথেয় হোক।

SHADWAL

শাদ্বল

SHADWAL PATRIKA

EDITOR: NRIPENDRA NARAYAN BHATTACHARYA

COVER DESIGNING: SOUKARSHA BHATTACHARYA

SHIBJAGNA ROAD

KHAGRABARI

COOCHBEHAR

সমাপ্ত